ভ্যান গঘের জীবন যাপন

জীবন যাপনের সঙ্গে ছবিকে মিলিয়ে দিতে পারেন কি শুধু শিল্পীরাই? সাধারণ মানুষের জীবনে কি ছবি-যাপনের কোনোও স্থান নেই? সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ শিল্পীদের চিত্র-যাপনের পার্থক্যটা ঠিক কোথায়? এই লেখায় সেইসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টায় মৃণাল নন্দী।

বিশ্ববরেণ্য একজন চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যদি দশজন চিত্রশিল্পীর নাম লিখতে বলা হয় পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে – সে তিনি ছবি-বোদ্ধা হন বা না হন – তবে ভ্যান গঘের নাম অবশ্যই থাকবে সেই প্রতিটি তালিকাতেই। যে কোনো আঁতেলেক্চুয়াল ব্যক্তি নিজের চিত্রবোধ বোঝানোর জন্য যদি কোনো শিল্পীর নাম নেন তবে তার মধ্যে অবশ্যই এসে যাবেন ভ্যান গঘ।

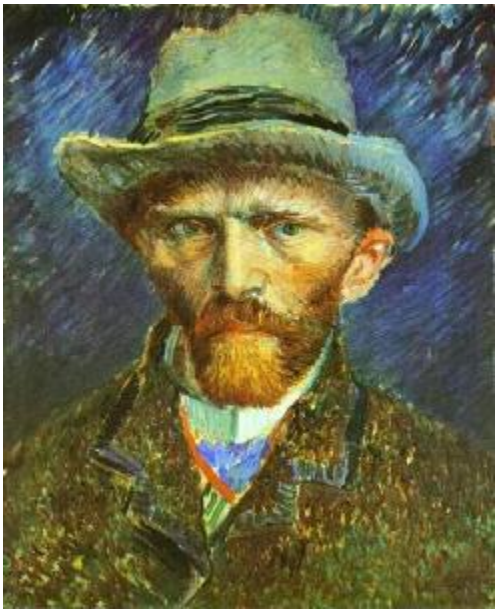

কিন্তু যদি আজকের দিনে না দাঁড়িয়ে এই ছবিটাই আমরা দেখি তাঁর সমকালে, ভ্যান গঘের জীবনকালে? ঠিক উল্টো ছবিটাই তো দেখব আমরা। নিজের জীবনকালে সামান্য শিল্পীর মর্যাদাটুকুও পাননি তিনি। একটাও ছবি বিক্রি হয়নি তাঁর। কেউ পাত্তাও দেয়নি শিল্পী হিসাবে বা মানুষ হিসাবেও। যে সম্মান তিনি পাচ্ছেন মরণোত্তর, সেই সম্মানের কণামাত্র তিনি যদি পেতেন তাঁর জীবনকালে তবে হয়ত চিত্রশিল্পের ইতিহাসটাও অন্যরকম হতো।

কিন্তু সেই পাত্তাহীন সময়ের যাপন-চিত্রটা কেমন ছিল ভ্যান গঘের? জন্ম আর্ট ডিলারের ঘরে হওয়ায় চিত্রবোধ তৈরি হওয়া নিয়ে কোনও সন্দেহ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যা হওয়া উচিৎ আর যা হয় তার মধ্যে পার্থক্যও তো থাকে আকাশ-পাতাল। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের দাদুও ছিলেন ভিনসেন্ট। তিনি ছিলেন ধর্মযাজক। আর্ট ও ধর্ম – দুটোই ভ্যান গঘ পরিবারের মূল কেন্দ্র। আমাদের ভিনসেন্ট, অর্থাৎ চিত্রশিল্পী ভিনসেন্ট ভ্যান গঘ কিন্তু প্রথম জীবনে আর্ট ছেড়ে ধর্মকেই বেছে নিয়েছিলেন জীবনের মূল লক্ষ্য হিসাবে। যদিও প্রথম দিকে নিজেদের পারিবারিক আর্ট ডিলারের ব্যবসাতে গুপিল কোম্পানীতে যোগ দিয়েছিলেন সামান্য কর্মচারী হিসাবেই। কিন্তু জমিয়ে ওঠার আগেই সেখান থেকে ছাঁটাই হন তিনি। এরপর ধর্মশিক্ষার জন্য

আমস্টারডামে রওনা দেন। নিজের কাকার বাড়িতে থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে থাকেন এবং ব্যর্থ হন। এরপর সেখান থেকেও চলে আসেন।

আসলে জীবনের মূল লক্ষ্যটাই খুঁজে পাচ্ছিলেন না তিনি। একদম সাধারণ মানুষই ছিলেন। বেলজিয়ামের বোরিনেজ জেলায় একটি কয়লা-খাদান এলাকার মিশনারিতেও বেশ কিছুদিন কাজ করেন তিনি ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায়। কিন্তু সেখানেও স্থির হতে পারেননি। আসলে বোধহয় মন থেকে কোনো আকর্ষণ এই কাজগুলোতে তিনি পাচ্ছিলেন না। সেখানে অবসর সময় কাটাতেন স্থানীয় কুলি-কামিনদের স্কেচ এঁকে।

এরপর আবার ফিরে যাওয়া বাড়িতে। এক অখন্ড অবসর, কিন্তু সেই অবসরে নেই কোনোও আনন্দ। লক্ষ্যহীন জীবনকে বয়ে নিয়ে চলার যন্ত্রণা আর দিনগত পাপক্ষয়ের এক চূড়ান্ত অপচয়-মূলক জীবন। লক্ষ্যহীনভাবে করা কিছু স্কেচই অবশেষে তার জীবনের গতিপথ পাল্টে দিল। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘকে আবিষ্কার করলেন তাঁর ভাই থিওডোরাস ভ্যান গঘ, যাকে ভিনসেন্টের সমস্ত চিঠিপত্রে আমরা থিও বলেই চিনি। ভিনসেন্ট যেমন তাঁর ভাইয়ের অবাধ্য হতনা, তেমনই থিও তাঁর দাদাকে ভালবাসতো নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক। এই ভাইয়ের পরামর্শেই ছবি নিয়ে আলাদাভাবে ভাবতে শুরু করলেন ভিনসেন্ট। গেলেন ব্রাসেলস্-এ বিখ্যাত ডাচ শিল্পী উইলিয়াম রোয়েল্ফ (Willem Roelofs) এর কাছে, যিনি ব্রাসেলস্-এর অ্যাকাডেমি অফ রয়াল আর্ট-এ ভিনসেন্টকে ভর্তি করতে সাহায্য করলেন। শিখলেন পার্সপেক্টিভ কাকে বলে, শিল্পের মূলতত্ত্ব আর চিত্রকলার কিছু মূল নিয়মকানুন।

এরপর আবার ইটেনে ফিরে এলেন তিনি, চর্চা কিন্তু চলতেই থাকলো। সেখান থেকে হেগ্ শহরে প্রায় স্থায়ীভাবে আস্তানা নিলেন। গেলেন তৎকালীন নামকরা শিল্পী আন্তন মভ্-এর কাছে। তাঁর কাছে শিখলেন তেলরং ও জলরঙের কাজ। এরমধ্যেই ভ্যান গঘ বুঝে গেছেন জীবনের মূল লক্ষ্য। ছবি ছাড়া তাঁর জীবনের আর কিছুই নেই। ছবি আঁকার জন্য সবকিছু করা যায়। এটাই তাঁর জীবনের প্যাশন হয়ে উঠল।

আসলে প্যাশন ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব নয়। ভ্যান গঘের ছবির প্রতি ভালবাসা এতটাই ছিল, স্বপনে-জাগরণে ছবি তাঁকে এমনই ঘিরে রেখেছিল যে তাঁর নেশাদ্রব্যও ছিল সাধারণ নেশাদ্রব্যের চেয়ে আলাদা, রঙের টিউব। নেশা করার জন্য টিউব থেকে রং খেয়ে ফেলতেন তিনি। ছবি আঁকার জন্য ঠা-ঠা রোদ্দুরে আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে থেকে যেতেন সারাটা দিন, রোদের রং ধরার জন্য। রাতের আকাশের রংকে বোঝার জন্য শীতের রাতেও পড়ে থাকতেন খোলা আকাশের নিচে। আসলে ছবি আর জীবন এ দুটোকে আর আলাদা

করতে পারছিলেন না তিনি। ছবির সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবন মিলেমিশে একাকার। জীবন-যাপন আর ছবি-যাপন ভ্যান গঘের কাছে একই রকম অর্থ বহন করেছিল।

যখন তিনি আর্ল (Arles) শহরে ছিলেন, নিজের বাসস্থানটাকেই করে তুলেছিলেন মিউজিয়াম। হলুদ বাড়ি বা Yellow House নামেই বিখ্যাত হয়ে যায় বাড়িটা। আসলে হলুদ রং নিজেই যেন ভ্যান গঘের পরিচিতি হয়ে ওঠে একটু একটু করে। রঙের উজ্জ্বলতা আর তীব্রতার জন্য হলুদ রং ব্যবহার তিনি একদম নিয়ম করে ফেলেছিলেন। হয়ত জীবনের যত ব্যথা-বেদনা ও দুঃখকে হলুদের উজ্জ্বলতা দিয়ে একদম ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তাঁর ছবিতে যে রঙের ব্যবহার দেখা যায়, তা তার জীবনের সাদা-কালো দুঃখের একদম বিপরীত। হয়ত ছবি-যাপনের মধ্যে দিয়ে জীবনের হতাশা আর বেদনাগুলোকে ভুলতে চাইতেন তিনি।

ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের অ্যাসাইলামে থাকার সময়টাও অদ্ভুত। রং আর তুলি হাতে নিলেই যেন একদম সুস্থ-স্বাভাবিক একজন মানুষ। হয়ত তাঁর জীবন-যাপন পদ্ধতিটাই সমাজের চোখে পাগলামি হয়ে ধরা পড়ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র রাস্তা তিনি পেয়েছিলেন ছবির মাধ্যমেই। প্যাশনেরই তো আর একটা নাম পাগলামি!

'প্যাশনেট' ভিনসেন্টই প্রেমিকাকে উপহার দেন নিজের কান। এঁকে যেতে পারেন নিজের বিদায়-চিত্র। আর তারপরেই করতে পারেন আত্মহত্যা।

কিন্তু এই আত্মহত্যাতেই যদি থেমে যেত ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের জীবন-যাপন তবে তো আজ আর আলোচনার কোনও দরকারই হতো না তাকে নিয়ে। ভিনসেন্টের জীবন-যাপনের একটা পর্ব শেষ হল তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু আর একটা চিরন্তন পর্ব শুরু হল এখান থেকেই।

ভিনসেন্টের প্রতিভার আবিষ্কারক থিও বা থিওডোরাস ভ্যান গঘকে প্রায় নিয়মিত চিঠি লিখতেন তিনি। থিয়ো উত্তরও দিতেন প্রায় নিয়মিত। এছাড়া মা, বোন ও বন্ধু পল গগাঁকে লেখা চিঠিও বেশকিছু। আরও বেশকিছু অন্য প্রয়োজনীয় চিঠি। এই চিঠিগুলোই শেষ পর্যন্ত থেকে গেছিল চিত্রশিল্পী ভ্যান গঘের জীবন-যাপনের চিহ্ন হিসাবে। আসলে চিঠিগুলো যত্ন করে সংরক্ষণের কাজ শুরু করেছিলেন থিয়োডোরাস। কিন্তু তার অকাল প্রয়াণের পর সেই কাজ নিজ দায়িত্বে কাঁধে তুলে নেন থিও-র স্ত্রী য়োহানা। এই সংরক্ষণও যেন ভিনসেন্টের জীবন-যাপনেরই পরিবর্ধিত রূপ।

একসময় এই চিঠি খুঁজে পায় তার গন্তব্য। এক আমেরিকান সাংবাদিক আরভিং স্টোনের হাতে গিয়ে পড়ে ভ্যান গঘের চিঠিগুলো। শিল্পীর মৃত্যুর চল্লিশ বছর পর। তখনও ভ্যান গঘ ততটা বিখ্যাত হয়ে ওঠেননি বাকি পৃথিবীর কাছে। আরভিং স্টোন আকৃষ্ট হলেন এবং হয়ে গেলেন ভিনসেন্টের জীবন-যাপনের অংশীদার। একজন শিল্পী যিনি জীবদ্দশায়

সামান্য শিল্পীর সম্মানটুকুও পাননি, যাঁর একটাও ছবি বিক্রি হয়নি তাঁকে নিয়ে লিখতে থাকেন এক উপন্যাস। যে শিল্পী চেয়েছিলেন জীবনকে বুঝতে এবং সেই জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে ক্যানভাসে তাঁর জীবনটাই আরভিং স্টোন চেষ্টা করলেন উপন্যাসের আকারে ধরে রাখতে। শেষও করলেন সেই কাজ।

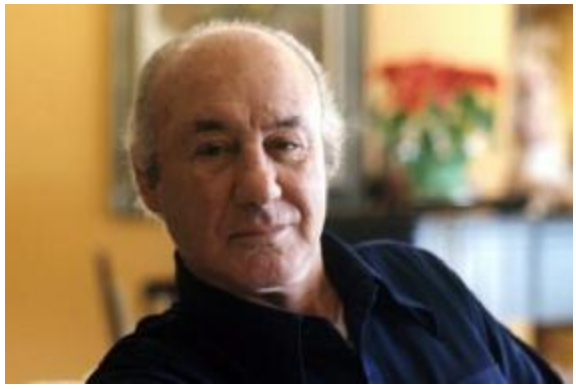

কিন্তু বিধি বাম। তিন বছর ধরে প্রকাশকদের দরজায় দরজায় ঘুরতে থাকলেন তিনি। প্রত্যেকেই ফিরিয়ে দিলেন তাঁকে। সতেরোজন প্রকাশকের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর আঠেরো নম্বর প্রকাশক নিতান্ত অনিচ্ছায় রেখেদিলেন পাণ্ডুলিপি। 'অখ্যাত এক শিল্পীর জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস কি আর বিক্রি হয়? তাও আবার অখ্যাত এক লেখকের লেখা' – এই ছিল মানসিকতা। তবুও এক সময় প্রকাশও পেল সেই উপন্যাস, 'লাস্ট ফর লাইফ'।

প্রকাশের পর শুধু একটাই ঘটনা ঘটেছিল সবার অলক্ষ্যে। যে সতেরোজন প্রকাশক প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁরা তখন শুধু হাত কামড়াচ্ছিলেন নিজেদের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ পেয়ে। কারণ অখ্যাত শিল্পীর জীবন তখন বেস্ট সেলারের তালিকায়। আর আরভিং স্টোন? তাঁর জীবনটাও বদলে গেল। একের পর এক লিখলেন উপন্যাস, যার বেশিরভাগই শিল্পকলা ও জীবনী সংক্রান্ত।

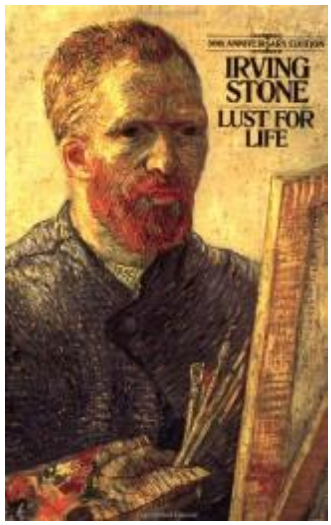

এরও বাইশ বছর পর। 'লাস্ট ফর লাইফ' থেকে ঐ নামেই তৈরী হল একটি সিনেমা। ভিনসেন্ট ভ্যান গঘের ভূমিকায় অভিনয় করলেন অভিনেতা কির্ক ডগলাস। আর এটাই হয়ে থাকল তাঁর অভিনয় জীবনের অন্যতম সেরা হিসাবে।

ভিনসেন্ট আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন যে জীবন যাপনটাই আসল। শিল্পের প্রতি ভালবাসাটাই অবশেষে জয়ী হয় জীবনের কাছে।

শেষ পর্যন্ত 'স্ট্র হ্যাট'-টা খুলে আমাদের স্যালুট জানাতেই হয় সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ শিল্পী হয়ে ওঠা এই মানুষটাকে।

চিত্র পরিচিতি : ১। ভিনসেন্টের আত্মপ্রতিকৃতি; ২। স্টারি নাইট, শিল্পী : ভিনসেন্ট; ৩। থিওডোরাস ভ্যান গঘ; ৪। লেখক আরভিং স্টোন; ৫। লাস্ট ফর লাইফ বইয়ের প্রচ্ছদ।